একজন জাপানী আশ্রমবাসীর কথা

- কাজুহিরো ওয়াতানাবে

এ কথা সবার জানা যে ভারতবর্ষ এবং জাপানের মধ্যে যোগাযোগের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরের বছর, অর্থাৎ ১৯০২-এ পঁচিশ বছর বয়সী জাপানী যুবক শিতোকু হোরি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম বিদেশী ছাত্র হিসাবে শান্তিনিকেতনে পড়তে শুরু করেন। তখন জাপানে শিন্তো ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেয়ার সরকারি নীতির অধীনে বৌদ্ধ ধর্ম সংকটাপন্ন অবস্থায় ছিল। সেই পরিস্থিতিতে পুরোনো রাজধানী নারার এক বৌদ্ধ মঠের সন্তান শিতোকু হোরি মনে করলেন বৌদ্ধ ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে প্রথমে এই ধর্মের জন্মভূমি ভারতে গিয়ে এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে তিনি মনীষী তেনশিন ওকাকুরার সফরসঙ্গী হয়ে কলকাতায় পাড়ি জমান এবং ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ পরের বছর লাহোরে এক দূর্ঘটনার পর টিটেনাসে আক্রান্ত হয়ে তিনি প্রাণ হারান।

হোরির পর আরও অনেক জাপানী শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। কেউ কেউ হোরির মত শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে , কেউ বা জাপান সংক্রান্ত নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য। রবীন্দ্রনাথ জুডো (তখনকার দিনে "জুজুৎসু" বলা হত)-র শিক্ষক হিসাবে শিন্‌যো তাকাগাকি-কে এবং জাপানী কায়দায় চা পরিবেশন করতে শেখানোর জন্য মাকিকো হোশি-কে আমন্ত্রণ করেন। তেনশিন ওকাকুরার প্রতিষ্ঠিত চিত্রশিল্প সংগঠনে যোগদানকারী যে কজন বিশিষ্ট শিল্পী তেনশিনের পরামর্শে ভারতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাম্পো আরাই বেশ কয়েক দিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু সহ বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে ভারত ও জাপানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধিতে অবদান রাখেন।

হোরি, তাকাগাকি ও আরাই-এর মত আরও যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ৎসুশো বিয়োদো। বিয়োদো যখন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন নিয়ে লেখাপড়া করছিলেন, সেই ১৯২৪ সালে টোকিওতে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার সুযোগ হয় তাঁর। এর আট বছর পর তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষায় উন্নততর গবেষণার জন্য শান্তিনিকেতনে যান। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁকে বিশ্বভারতীতে একটি জাপান সম্বন্ধীয় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর অনেক বছর পর ১৯৯৪ সালে বিয়োদো ও অধ্যাপক কাজুও আজুমাদের প্রচেষ্টা এবং বহু জাপানী নাগরিকের সহযোগিতায় সংগৃহিত অর্থ দিয়ে শান্তিনিকেতনে নির্মিত নিপ্পন ভবনের উদ্বোধন হয়।

এক্ষুনি যে নামটি উল্লেখ করলাম , সেই অধ্যাপক আজুমা সম্বন্ধে এই লেখার পাঠকদের নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়। তিনি প্রচুর অনুবাদ ও লেখার মাধ্যমে জাপানীদের রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক আজুমা ১৯৬৭ সাল থেকে চার বছর শান্তিনিকেতনে জাপানী ভাষা ও জাপানী সাহিত্য নিয়ে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি বিশ্বকবিকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণায় নিয়োজিত হন।

অধ্যাপক আজুমার মত আরও কয়েকজন জাপানী অধ্যাপক বিশ্বভারতীতে মূলত জাপানী ভাষার শিক্ষকতা করেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন শিন্‌ইয়া কাসুগাই, যিনি তেনশিন ওকাকুরার সঙ্গে প্রিয়ংবদা দেবীর পত্র-বিনিময়ের ব্যাপারটি উদ্ঘাটন করেন, এবং তাৎসুও মোরিমোতো যিনি কৃষ্ণ কৃপালানির লেখা রবীন্দ্রনাথের জীবনী জাপানীতে অনুবাদ করেছেন।

তবে আজ যে ব্যক্তির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরতে চাই, তিনি বিশ্বভারতীতে জাপানী অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দিন সেই চাকরিতে ছিলেন। তাঁর নাম সাইজি মাকিনো।

অধ্যাপক মাকিনো ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৫ বছর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা ও জাপানী সংস্কৃতি পড়িয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি শান্তিনিকেতনেই থেকে যান। এবছর গোড়ার দিকে হঠাৎ খবর আসে যে মিঃ মাকিনো জানুয়ারী মাসে ঝাড়খণ্ডে বৃক্ষ রোপণ অভিযানে অংশ নিয়ে সেখানে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হিসাবে ১৯৭৪ সালে চাকরিতে ঢুকলেও ভারতে তাঁর জীবন শুরু হয় আরও অনেক আগে -- ১৯৫৮ সালে , অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরেরও বেশী সময় তিনি ভারতে কাটিয়েছেন।

অধ্যাপক মাকিনো তাঁর মায়ের প্রভাবে জাপানের একজন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা নিচিদাৎসু ফুজিই-র ভক্ত-তে পরিণত হন। ফুজিই ভারত সহ বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের অভিযান চালিয়েছিলেন। নিচিদাৎসু ফুজিই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনেরও সমর্থক ছিলেন এবং তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। এই সম্পর্কটা সাইজি মাকিনো-কে ভারতে নিয়ে গেল। তিনি হিন্দুস্থানী-তামিলি সঙ্ঘের আমন্ত্রণে ১৯৫৮ সালে কলকাতায় যান। তখন তাঁর বয়স ৩৪ বছর। কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্রের সেবাগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে গিয়ে পশু রোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। সেবাগ্রামে দু বছর থাকার পর তিনি শান্তিনিকেতনে যান। ভারতে কাজ করতে হলে যে ভালরকম ভাষাজ্ঞান থাকা দরকার, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সহকর্মীদের সুপারিশে হিন্দী শেখার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনকে বেছে নিয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে বছর দুয়েক খুব মন দিয়ে হিন্দী শিখেছেন মিঃ মাকিনো। তার ফলে এই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে-পড়তে তাঁর আর কোনো অসুবিধা হত না। হিন্দী ভাষায় এই দক্ষতা তাঁর পরবর্তী জীবনে খুব কাজে লেগেছে। শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা শেষে তিনি মধ্যপ্রদেশে যান , এবং একটি গ্রামে স্থানীয় বেসরকারী বিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে চাকরি শুরু করেন। সেই গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল না , পর্যাপ্ত জলেরও অভাব ছিল। সেখানে তিন-চার বছর কাজ করার পর একটি কোম্পানীতে

নতুন চাকরি পান। মধ্যপ্রদেশেরই গোয়ালিয়র শহরে অবস্থিত এই কোম্পানীর সাথে জাপানের একটি মেশিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ছিল। প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য জাপানের এই কোম্পানী থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ারদের দোভাষী হিসাবে কাজ শুরু করেন মিঃ মাকিনো। কিন্তু কোম্পানীর ব্যবসা ভাল না চলায় তিন বছরের মাথায় তিনি চাকরিটি হারান। এর পর পরই জাপান থেকে তাঁর স্ত্রী ইউকির আগমন হয়। আসলে মিঃ মাকিনো ১৯৫৮ সালে যে জাহাজে করে ভারতে পৌঁছান, সেই জাহাজে ইউকি-ও ছিলেন। ইউকির দাদা কলকাতায় থাকতেন। তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ইউকি ভারতে গিয়েছিলেন। সেবার তিনি কিছু দিন কলকাতায় চাকরি করেন। শান্তিনিকেতনে মিঃ মাকিনোর পড়াশোনার খরচ তিনিই বহন করতেন। এর পর একসময় ইউকি জাপানে ফিরে বিবাহের আইনগত প্রক্রিয়া চুকিয়ে আবার ভারতে যান মিঃ মাকিনোর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করার জন্য। ১৯৬৮ সালের ৩১শে জুলাই তাঁদের কন্যা সেৎসু-র জন্ম হয়। ইতিমধ্যে মিঃ মাকিনোর নতুন চাকরি জুটেছে। গুজরাতের বরোদা শহরে তখন সার কারখানা নির্মাণের কাজে যুক্ত বহু জাপানী প্রযুক্তিবিদ্ বাস করতেন। মিঃ মাকিনো তাঁদের দোভাষী ও সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ আরম্ভ করেন। তার পর একই কাজের সূত্রে মাকিনো পরিবার চলে যান গোয়ায়। ১৯৭৪ সালে সার কারখানা নির্মাণ শেষ হলে জাপানী কর্মচারীরা স্বদেশে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করেন। মাকিনো দম্পতিও কন্যাকে নিয়ে জাপানে ফিরবেন বলে প্রায় মনোস্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তখন অকস্মাৎ বিশ্বভারতী থেকে একটি চিঠি মিঃ মাকিনোর হাতে গিয়ে পৌঁছায়। চিঠিটি ছিল বিশ্বভারতীতে জাপানী ভাষা শেখানোর আমন্ত্রণপত্র। এতে রাজি হয়ে মিঃ মাকিনো সপরিবার শান্তিনিকেতনে চলে যান। এইভাবে ১২ বছর পর আবার শুরু হয় তাঁর আশ্রম জীবন।

অধ্যাপক মাকিনোর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে যখন আমি প্রথম বারের মত ভারতে বেড়াতে যাই। আমি তখন টোকিওর বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। হিন্দীর পাশাপাশি সবে বাংলাও শিখতে শুরু করেছি। আমার কাছে শান্তিনিকেতন ছিল "বাংলা ভাষার তীর্থস্থান"-এর মত। তাই ভারতে পৌঁছে ভ্রমণসঙ্গী দুই বন্ধুর কাছ থেকে আলাদা হয়ে আমি একলা শান্তিনিকেতন-মুখো হলাম। কলকাতাবাসী একজন জাপানীর কাছ থেকে অধ্যাপক মাকিনোর নাম শুনে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর অফিস ছিল চীনা ভবনের এক কোনায় একটি ঘরে। অফিসটি পুরোনো এবং সাদামাটা। ঘরের ভিতরে একটি ডেস্ক, তার সামনে একজন প্রৌঢ় (তখন আমার তাই মনে হয়েছিল) ব্যক্তি বসে আছেন। তিনিই অধ্যাপক মাকিনো। আমার গলা শুনে তিনি মুখ তুললেন। রোগা-পাতলা শরীর, ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল সবই প্রায় পেকে গেছে। আমি টোকিওতে হিন্দী শিখছি শুনে খুশী হলেন এবং অফিসের ভিতরটা ঘুরিয়ে দেখালেন। এই অফিস ক্লাসরুম হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। দেখলাম লাগোয়া একটি ছোট্ট লাইব্রেরীও আছে। তার পর অধ্যাপক মাকিনো সাইকেল টানতে টানতে আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে টিফিন বাক্স ঝুলছিল। তাঁর কথা বলার ধরণে পশ্চিম জাপানের কোমল টান ছিল। এ্যাণ্ড্রুস পল্লীর ১১ নম্বর বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। বাড়ির সামনে মাঠে সাত বছরের মেয়ে সেৎসু ওরফে সেচ্চান খালি পায়ে ছোটাছুটি করছিল। ওকে দেখে খুব মিষ্টি লাগল। সেই দিন মিঃ মাকিনোর বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করেছিলাম। কি খেয়েছিলাম আজ আর তা মনে করতে না পারলেও, এ কথা পরিস্কার মনে আছে যে অধ্যাপক মাকিনোর বাড়িতে ভাল লেগেছিল খুব।

কেন শান্তিনিকেতন আমাকে এত আকৃষ্ট করে, তা গুছিয়ে বলতে পারব না। তবে শান্তিনিকেতনের নাম শুনলে মনে যে দৃশ্যটি ভেসে ওঠে, সেটি ১৯৭৫ সালের প্রথম শান্তিনিকেতন ভ্রমণের সময় দেখা। বোলপুর স্টেশন থেকে রিক্সায় চেপে শান্তিনিকেতনের দিকে যাচ্ছিলাম। রাস্তার অপর দিক দিয়ে একটি রিক্সা এসে যখন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন সেই রিক্সার আরোহী সাদা রঙের জামা পরা এক ভদ্রলোক আমার উদ্দেশ্যে হাঁক পেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কটা বাজে বাবু ?" একদম সাদাসিধে কথা, কিন্তু এখনো মনে গেঁথে রয়েছে, কারণ সেটাই ছিল আমার প্রথম বোধগম্য হওয়া বাংলা। চট্ করে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি বটে, তবে তখন দেখা নীলাকাশ আর রাস্তার পাশে সবুজ বনের রঙের সাথে ওই ভদ্রলোকের অবয়ব মিলেমিশে আমার মনে স্বপ্নের চেহারা নিয়েছে। সেই রূপকথার মত দৃশ্য দেখার ইচ্ছাতেই সম্ভবত আবার শান্তিনিকেতন যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে টোকিওতে "দৈবক্রমে" বাংলা ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাকরি পেয়ে গেলাম। ভাষার প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ যখন হল, নির্দ্বিধায় শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলাম। তবে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মাত্র ছয় মাসের জন্য প্রশিক্ষণের অনুমতি পাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মাকিনোর মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা হল। তিনি না থাকলে আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়ত সম্ভব হত না।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে থাকার জায়গা খুঁজতে হল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক ছাত্র না হওয়ায় আমার পক্ষে হোস্টেলে থাকা সম্ভব হয় নি। আবার অধ্যাপক মাকিনোর শরণাপন্ন হতে হল এবং তাঁর সাহায্যে পৌষালী নামক একটি হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হল। সম্পূর্ণ দেশী ধাঁচের হোটেল, সকাল ও রাতের খাবার

সহ এক মাস থাকার ভাড়া ৬০০ টাকা, তখনকার বিনিময় হার অনুযায়ী ১৮ হাজার ইয়েনের মত। খরচ কম হলেও ঐ হোটেলের সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল খাবার। কাঁকর মেশান ভাত, তরকারিও স্বাদহীন। ফলে ছয় মাসেই আমার ওজন কমে গিয়েছিল ৮ কেজি। প্রথম দিকে ভেবেছিলাম বেশী দিন থাকা যাবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে গেল। উপরন্তু হোটেলের মালিকের সাথে গড়ে উঠল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। মালিক দম্পতির ছয়টি সন্তান। বড় জনের বয়স ১৭, সব থেকে ছোট ছেলের বয়স ৩ বছর। রোজ তাদের সঙ্গে খেলতাম এবং বেড়াতাম। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অত্যন্ত সুন্দর বাংলা

ও বাংলা ভাষার আকর্ষনীয় দিক সম্বন্ধে জানার পাশাপাশি বাচ্চাদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমেও শিখেছি অনেক।

দিনের বেলায় সোমেনদার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ, তাই তাঁর বাড়িতে রাতে পড়তে যেতাম। পথে পড়ত শ্মশান। যে দিন আকাশে চাঁদ দেখা যেত না, একটু যেন ভয় ভয় করত। তাছাড়া অন্ধকারের মধ্যে থেকে হঠাৎ অন্য সাইকেল এসে আবির্ভূত হলে চম্‌কে উঠতাম -- যেন ভূত দেখছি ! তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে কেউ সাইকেলের বাল্ব জ্বালাত না। তবে আকাশে চাঁদ থাকলে অসুবিধা হত না। পূর্ণিমা হলে তো কথাই নেই। স্নিগ্ধ বাতাস আর চাঁদের আলোর মধ্যে সাইকেল চালানো ছিল অত্যন্ত আনন্দময় অভিজ্ঞতা। পূর্ণিমার রাতে প্রায়ই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের ছাদে জ্যোৎস্না-স্নান করতাম। জীবনে প্রথম শান্তিনিকেতনেই জ্যোৎস্নার আলোয় মাটিতে গাছের ছায়া পড়তে দেখেছি। জ্যোৎস্নার নীল আলোয় আলোকিত শান্তিনিকেতনের মত সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না।

বিশ্বভারতীতে অধ্যাপকদের অনেকেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ক্লাসে যেতেন। দেখতাম ক্লাসের আগে বা পরে অধ্যাপকরা হাসিমুখে গল্প করতে করতে চলেছেন। বাতাসে তাঁদের ধুতির কোঁচা পত পত করে উড়ত। ঐ দৃশ্যও আমার খুব ভাল লাগত।

অধ্যাপক মাকিনোর অফিসে মাঝে মাঝে যেতাম। সেখানে জাপানী ভাষার ছাত্রছাত্রীদের সাথে পরিচয় হয়। কেউ কেউ এমন আগ্রহ নিয়ে ভাষাটা শিখছিল যে সে বছর কলকাতায় জাপানী ভাষায় দক্ষতা যাচাই-এর পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছিল বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরাই।

শান্তিনিকতনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মাকিনো দম্পতি আমাকে সাহায্য করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যেতাম। সে সময় বিশ্বভারতীতে জাপানী ছাত্রছাত্রী ছিলেন আট/দশ জন। সত্যি বলতে কি, বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাপানীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ট। তাঁদের মধ্যে অনেকে কলাভবনে পড়াশোনা করতেন। অধ্যাপক মাকিনোর বাড়িতে প্রায়ই আশ্রমবাসী জাপানীদের নিয়ে পার্টি হত, আর তাতে যোগ দিয়ে আমরা আনন্দ করতাম।

একদিন অধ্যাপক মাকিনোর বাড়িতে চিত্রকর হুকু আকিনোর সঙ্গে পরিচয় হল। মিয আকিনো জাপানী চিত্রকলার জগতে নামকরা শিল্পীদের একজন। তিনি পরবর্তী কালে জাপানের সব থেকে সম্মানজনক সাংস্কৃতিক পুরস্কার Order of Culture পেয়েছেন। ভারতপ্রেমী আকিনোর বয়স তখন ৭৭ বছর। এক সময় তিনি শান্তিনিকেতনে কলা ভবনের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি এমনই ভারতপ্রেমী ছিলেন যে তিরিশ বারেরও বেশী ভারতে গিয়েছেন এবং ভারতের অসংখ্য ছবি এঁকেছেন।

একবার মিয আকিনো এবং অধ্যাপক মাকিনোর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্গাপুরে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হল। পোড়া মাটির মন্দির ও হাতে বোনা শাড়ীর কারখানা যখন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তখন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আমরা একটি মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় সূর্যের আলো এসে পড়ল। সেই দৃশ্যকে হুকু আকিনো পরে ছবিতে এঁকেছেন। সেটি তাঁর খুবই বিখ্যাত ছবি।

আমি জাপানে ফিরে আসার কয়েক বছর পর অধ্যাপক মাকিনো কিছু দিনের জন্য জাপানে এসেছিলেন। দেশের বাড়ি যাওয়ার পথে তিনি কিয়োতোয় মিয আকিনো সঙ্গে দেখা করতে যাবেন শুনে তাঁর সফরসঙ্গী হলাম। টোকিও স্টেশনে পৌঁছে দেখি অধ্যাপক মাকিনো জাপানী কিমোনো পরে এসেছেন। বহু দিন পর জাপানে ফিরে সম্ভবত তাঁর শৈশবের পরিধান ঐ পোশাক আবার ব্যবহার করতে ইচ্ছা করছিল। মিয আকিনোর বাড়ির বাগানে ছিল বাঁশের বন। সেখানে ভ্রমণরত কিমোনো পরিহিত অধ্যাপক মাকিনো-কে দেখাত খুব সুন্দর।

তার পর বহু দিন অধ্যাপক মাকিনোর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাই নি। ২০০৯ সালে তিনি জাপানে এসেছিলেন নিজের লেখা "ভারতে ৪০ বছর" নামক বইটির প্রকাশনা উপলক্ষে। টোকিওতে তাঁর বক্তৃতা সভা হয়েছিল, সেখানে তাঁর সঙ্গে বহু দিন পর আবার দেখা হয়। কিন্তু সেটাই শেষ দেখা। ভারতে ৫০ বছরেরও বেশী অতিবাহিত করে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক মাকিনো ভারতেই মাটিতে পরিণত হলেন।

৬৫ বছর বয়সে বিশ্বভারতী থেকে অবসর নেওয়ার পর অধ্যাপক মাকিনো মণিপুরে গিয়ে জাপানী ভাষা শেখানোর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। আসলে মণিপুরে যাওয়া ছিল তাঁর অনেক দিনের স্বপ্ন। ১৯৮২ সালে আমি শান্তিনিকেতনে তাঁর মুখে মণিপুর যাওয়ার পরিকল্পনার কথা শুনি। সেই সময় অবশ্য বিদেশীদের মণিপুরে প্রবেশে অনেক বাধানিষেধ ছিল, যার ফলে তখন পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত হয় নি। তাঁর একজন প্রাক্তন ছাত্র মণিপুর বিশ্বিদ্যালয়ে জাপানী ভাষা শেখাতে আরম্ভ করেন। তিনিই স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সে পড়ানোর জন্য অধ্যাপক মাকিনো-কে আমন্ত্রণ জানান। অধ্যাপক মাকিনোর জন্ম ১৯২৪ সালে। তাঁর প্রজন্মের জাপানীদের মনে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলের নাম বিশেষ একটি অনুভূতি বয়ে আনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে সামরিক বাহিনীর বেপরোয়া অভিযানে বহু জাপানী সৈনিককে এখানে প্রাণ হারাতে হয়। অধ্যাপক মাকিনো নিজে সেই অভিযানে অংশগ্রহণ না করলেও ইম্ফল কেমন জায়গা তা যে দেখতে চাইতেন, সে কথা সহজেই অনুমেয়। মণিপুরে তিনি জাপানী ভাষা শেখানোর পাশাপাশি ইম্ফলে নিহত জাপানী সৈন্যদের আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা সভাগুলোতেও যোগদান করেন।

মণিপুর অধ্যাপক মাকিনোর খুব ভাল লাগত। ১৯৯০ সালের প্রথম সফরের পর তিনি মোট পনের বারেরও বেশী মণিপুরে গিয়েছেন। "ভারতে ৪০"-এ তিনি লিখেছেন, "এখানকার আবহাওয়া যে জাপানের মত, সেটা গাছপালা দেখলে বোঝা যায়। পাইন, বাঁশ, প্লাম, পীচ --সব জাপানের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া মণিপুরীদের চেহারা আমাদের মত। আমি এখানে হুবহু আমার দাদার মত দেখতে একজন স্থানীয় লোককে দেখেছি। এখানে পৌঁছাবার পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মনে হল যেন আমি জাপানে আছি। এখানে লোকজনের জীবনধারা, তাঁদের হাবভাব ও বাড়ির নির্মাণ শৈলী দেখলে পুরোনো জাপানের কথা মনে পড়ে। ৫০ বছর আগে আমরা ঠিক এ রকম ছিলাম। মানব মনের সহজ-সরলতা, মানুষে-মানুষে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যা জাপান থেকে হারিয়ে গিয়েছে, এখানে সেগুলো পাওয়া যায়"।

অধ্যাপক মাকিনো হিন্দীতে একটি বই লিখে গেছেন যার শিরোনাম "জাপানী আত্মার খোঁজ"।

আমার মনে হয়, অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশে পরিণত হওয়ার পর আমরা জাপানীরা মন-মানসিকতার দিক দিয়ে যা খুইয়ে বসেছি, অধ্যাপক সাইজি মাকিনো ভারতে ৫০ বছর ধরে তারই খোঁজ করছিলেন। ❑